তারিখ 13 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

সবার আগে শিক্ষার্থীর স্বার্থ

শিক্ষা আইনের ৫৪ ধারা

সমীর রঞ্জন নাথ

কর্মসূচি প্রধান, শিক্ষা গবেষণা ইউনিট
গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করেছে। এটি এখন চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নকল্পে এ ধরনের একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট মহলে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই এটি মন্ত্রিসভা হয়ে বিল আকারে জাতীয় সংসদে উঠবে। খসড়া বিলের মুখবন্ধে যদিও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কোনো উল্লেখ নেই; কিন্তু ৬৭টি ধারা সংবলিত বিলের ৫৪ নম্বর ধারায় শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টি নানা কারণেই গুরুত্ববহ। বিগত দুই দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিশুদের অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পথ এগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে জেন্ডারসাম্যতাও অর্জিত হয়েছে। এখন দরকার শিক্ষার মানোন্নয়ন। শিক্ষানীতিতেও মানোন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। সর্বোপরি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর শিক্ষা-সংক্রান্ত লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবেই শিক্ষার সর্বস্তরে মানসম্মত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়েছে।

খসড়া শিক্ষা আইনের ৫৪ ধারার ৪টি উপধারার সমন্বয়ে রচিত। এগুলো হলো– ১. সরকার প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ২. মুখস্থবিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সব পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে হবে; ৩. সরকার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ উত্তরপত্র পরীক্ষক এবং প্রশ্নপত্র মডারেটরদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং ৪. কোনো ব্যক্তি উপধারার (১) বিধান লঙ্ঘন করলে তা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

মনে হতে পারে, সরকার প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিং করা, শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা, সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা না হওয়া এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীদের দক্ষতার অভাবকে মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে দেখছেন। সন্দেহ নেই, এগুলো মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী উপাদান। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে, প্রাইভেট টিউটর ও কোচিং সেন্টারে যায় এবং শিক্ষক ও টিউটররা শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করাতে উৎসাহী হন? এর প্রধান কারণ, এ পদ্ধতিতে সহজে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়া যায়, কাঙ্ক্ষিত ফললাভও করা যায়। একই সঙ্গে এও সত্য যে, প্রাইভেট টিউটর ও কোচিং সেন্টার কাঙ্ক্ষিত ফললাভে সহায়তা করতে দারুণভাবে উপযোগী। যদি তা না হতো তাহলে কোটি শিক্ষার্থী এসব পথে পা বাড়াত না। অভিভাবকরা প্রাইভেট টিউটরের পেছনে অত অত পয়সা খরচ করতেন না। গবেষণায়ও দেখা গেছে, যেসব শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে বা কোচিং সেন্টারে যায় তারা পরীক্ষায় অন্যদের তুলনায় ভালো ফল করে।

> খসড়া শিক্ষা আইনের ৫৪ ধারার প্রথম তিনটি উপধারায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার যেভাবে করা হয়েছে তা ধারাটিকে অনেকটা দুর্বল করেছে। প্রথম উপধারায় 'সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে' না বলে সরাসরি বলা দরকার যে, শিক্ষার সব পর্যায়ে প্রাইভেট টিউটরিং ও কোচিং নিষিদ্ধ থাকবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ধারায় বলা দরকার, পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সব পরীক্ষা (বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক ও পাবলিক) সৃজনশীল পদ্ধতিতে গ্রহণ করবে

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের উপর্যুক্ত ধারাটিতে শিক্ষার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রধান একটি অনুষঙ্গ বাদ পড়ে গেছে। তা হলো, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ও তার কার্যাবলি। যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীকক্ষ। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের মানের ওপরই নির্ভর করে শিক্ষার সার্বিক মান। যদি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত ও সৃজনশীল করা যায় এবং এতে সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, তবে মানসম্মত শিক্ষার জন্য বড় কাজটিই করা হয়। এর সঙ্গে যোগ করা দরকার পাঠ্যবই পাঠের বাধ্যবাধকতা ও প্রাত্যহিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সৃজনশীলতা। মনে রাখা দরকার, শিক্ষাবর্ষ শেষে বা পাঁচ বছর পর গৃহীত সমাপনী পরীক্ষার চেয়ে প্রাত্যহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা শেখার জন্য অনেক বেশি ফলপ্রসূ। যদি প্রাত্যহিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীলতা আনা যায়, তবে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায়ও সৃজনশীলতা আসবে। শিক্ষার্থীরাও চেষ্টা করবে নিজ পাঠে সৃজনশীল হওয়ার। কারণ একটির সঙ্গে আরেকটি সরাসরি সম্পর্কিত। মানসম্মত শ্রেণীকক্ষের কার্যাবলি নিশ্চিত করার জন্য আরও দরকার প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের নৈমিত্তিক তদারকি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের ৫৪ ধারায় এ বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া হয়নি। আইনে এগুলো সংযুক্ত করে বিদ্যালয় ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের ওপর কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এর একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া দরকার।

শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের দুর্বল মানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত বিষয়াবলি হলো পাঠ মুখস্থ করার প্রবণতা, প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নেওয়া আর নোট, গাইড বইয়ের দ্বারস্থ হওয়া। যদি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের মান বাড়ানো যায়, তখন শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই দূর হবে। আর শ্রেণীকক্ষেই যদি পাঠ বোঝা ও শেখার বড় অংশটি হয়ে যায়, বাকি অংশ শিক্ষার্থীরা বাড়িতে নিজ উদ্যোগেই করে ফেলতে পারবে। শিক্ষার্থীদের নিজ উদ্যোগে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে শেখানোও শিক্ষাব্যবস্থার কাজ। তাহলেই তারা আস্তে আস্তে স্বাবলম্বী শিক্ষার্থী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। একজন স্বাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য সার্বক্ষণিক প্রাইভেট টিউটর রাখারও দরকার হয় না। সে নিজেই তার শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিতে পারবে, বন্ধু-বান্ধবেরও সহযোগিতা করতে পারবে। এভাবে প্রাইভেট টিউটরিং ও কোচিংয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে ও তা গ্রহণের প্রবণতা কমতে থাকবে।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষা আইনের বিধিবিধান আরও স্পষ্ট করা দরকার। খসড়া শিক্ষা আইনের ৫৪ ধারার প্রথম তিনটি উপধারায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার যেভাবে করা হয়েছে তা ধারাটিকে অনেকটা দুর্বল করেছে। প্রথম উপধারায় 'সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে' না বলে সরাসরি বলা দরকার যে, শিক্ষার সব পর্যায়ে প্রাইভেট টিউটরিং ও কোচিং নিষিদ্ধ থাকবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ধারায় বলা দরকার, পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সব পরীক্ষা (বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক ও পাবলিক) সৃজনশীল পদ্ধতিতে গ্রহণ করবে। তৃতীয় ধারাটি হওয়া উচিত নিম্নরূপ : প্রধান পরীক্ষকসহ উত্তরপত্র পরীক্ষক এবং প্রশ্নপত্র মডারেটরদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। অথবা উপযুক্ত প্রশিক্ষণবিহীন কাউকে প্রধান পরীক্ষক, উত্তরপত্র পরীক্ষক কিংবা প্রশ্নপত্র মডারেটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। চতুর্থ উপধারায় কেবল প্রথম উপধারার বিধান লঙ্ঘনকারীকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, বাকি দুটি উপধারার বিধান লঙ্ঘনকারীদের নয়। এটি একপেশে বিধান। বাকি দুটি উপধারা লঙ্ঘনকারীদেরও অপরাধী হিসেবে গণ্য করে দণ্ডের বিধান রাখা দরকার। তবেই ৫৪ ধারাটি মানসম্মত শিক্ষার দ্বার প্রশস্ত করে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে।

আশা করি, শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয়সহ যারা আইনটি প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন। শিক্ষার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়াবলিকে যদি শিক্ষা আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা দেওয়া না যায়, তাহলে ওই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বার্থই সবার আগে বিবেচনায় নিতে হবে। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে সেই স্বার্থেরই সুরক্ষা দেবে আর শিক্ষার্থীর স্বার্থ ক্ষুণ্নকারীদের শাস্তি দেবে– এটাই প্রত্যাশা।